ইউনিট ৫
ফল ধারণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ইউনিট ৫ ফল ধারণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফল চাষের জন্য ফল ধারণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গাছে ফল ধারণ বিভিন্ন কারণে বিঘ্নিত হতে পারে। পরিনামে গাছে ফল উৎপাদন কম হয়। এমন কি অনেক সময় গাছ কোনো ফল উৎপাদন করে না। গাছের ফলধারণ প্রক্রিয়া চার ধাপে সম্পন্ন হয়। এগুলো হলো (১) ফুল-কলার বৃদ্ধি শুর€ (২) পরাগায়ন পূর্ব বিকাশ (৩) পরাগায়ন পরবর্তী বৃদ্ধি এবং (৪) পরিপক্কতা, পাকা এবং বার্ধক্য প্রাপ্তি। ফল ধারণের উপোরক্ত চারটি ধাপের যে কোনোটি গাছের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কারণে ব্যাহত হতে পারে। গাছের ফল ও সঠিক সময় গাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ জন্য ফলকে অবশ্যই সঠিক পরিপক্কতায় গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ ফল উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ফল সংরক্ষণের বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে গাছে ফল ধারণ, বাগানে আন্তপরিচর্যা, অফলোদপাদিকার কারণ ও তার সমাধান, ফসল পর্যায়, সাথী ফসলের চাষ, ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ, সংগ্রহোত্তর ফলের শারীরবৃত্তীয় ও সংরক্ষণের নীতি, তাজা ফল সংরক্ষণের পরিবেশ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ আন্ত পরিচর্যা ও অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আন্ত পরিচর্যা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফল গাছে করণীয় আন্ত পরিচর্যাসম হ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফল গাছ অফলন্ত হওয়ার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অফলন্ত ফল গাছকে ফলবর্তীকরণের জন্য করণীয় কাজসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

আন্ত পরিচর্যা

জমিতে চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত ফল গাছের যত্ন নেয়ার জন্য যে সব কাজ করা হয় সেগুলোর নাম আন্ত পরিচর্যা (Intercultural operations)। ফল বাগানে বিভিন্ন আন্ত পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে আগাছা দমন, আন্ত কর্ষণ, সেচ, পানি নিষ্কাষণ, সার প্রয়োগ, অঙ্গ ছাটাই, সাথী ফসলের চাষ, ভূমিক্ষয় রোধ, পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন ইত্যাদি।

আগাছা দমন

আগাছা জায়গা, খাদ্য উপাদান, পানি ও সূর্য রশ্মির জন্য গাছের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং পোকা-মাকড়কে আশ্রয় দেয়। এজন্য স্বল্প মেয়াদী ফল গাছের জন্য আগাছা দমন একটি অন্যতম করণীয় কাজ। দীর্ঘ মেয়াদী ফলের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় আগাছা দমনের প্রয়োজন হলেও পরবর্তীতে তা খুব দরকার হয় না। কারণ আগাছা পরবর্তীতে দীর্ঘ মেয়দী ফলের সাথে টিকে থাকতে পারে না।

আন্ত কর্ষণ (Inter-tillage)

আগাছা দমন ও জমিতে রস সংরক্ষণের জন্য বর্ষার আগে এবং বর্ষার শেষে আন্ত কর্ষণের ফলে মাটিতে পানি প্রবেশ করে এবং শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে সংরক্ষিত পানি গাছের খুব উপকারে আসে।

মালচিং (Mulching)

খড়, গাছের পাতা, কালো প্লাষ্টিক ইত্যাদি মালচিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

মালচিং মাটিতে রস সংরক্ষণ এবং আগাছা দমনের জন্য বেশ উপকারী। খড়, গাছের পাতা, কালো প্লাষ্টিক ইত্যাদি মালচিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- আনারসের ক্ষেতে কালো প্লাষ্টিক মালচ আগাছা দমন ও মাটির রস সংরক্ষণে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পানি সেচ

অন্যান্য ফসলের ন্যায় ফল গাছে পানি প্রয়োজন। গাছের বৃদ্ধি ও ফলধারণের জন্য পানির দরকার। কলা, পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ ইত্যাদি ফল যাদের মূল অগভীর ধরনের সে সব ফলের বাগানে অবশ্যই শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ফল গাছে থালা পদ্ধতিতে (Basin system) সেচ প্রদান সবচেয়ে উপযোগী। প্রত্যেকটি থালা পানির প্রধান নালার সাথে সংযুক্ত করতে হবে। দুপুর বেলায় গাছের যে পারিমাণ জায়গায় ছায়া পড়ে থালাটি ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে। থালা পদ্ধতিতে বৃক্ষজাতীয় ফল গাছে সেচ প্রদানে পানির অপচয় কম হয় এবং গাছের সঠিক স্থানে পানি সেচ প্রদান সম্ভব হয়। অবশ্য স্বল্প মেয়াদী ফল যেমন কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফল বাগানে প্লাবন পদ্ধতিতেও সেচ প্রদান করা যায়। বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ফল বাগানে একবার সেচ প্রদান করতে পারলে ভালো।

পানি নিষ্কাশণ

আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যা প্রয়োজনের তূলনায় অনেক বেশি। সাথে সাথে পানিতল অনেক সময় মাটির সমতলে চলে আসে। যার দরুন বাগানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বিশেষ করে পেঁপে, কাঠাল ইত্যাদি ফল জলাবদ্ধতা মোটেই পছন্দ করে না। ফল বাগানে যেন জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয় এজন্য পানি নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাঠে সার প্রয়োগ

আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণত বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছের বাগানে নিয়মিত সার প্রয়োগ করেন না। এ জন্য ফলন অনেক কম পান। বাগানে সার প্রয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন বিষয় যেমন- মাটির উর্বরতা, গাছের প্রজাতি, আকার, মৌসুম ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। বৃক্ষজাতীয় ফল গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়ানো উচিত।

প্রুনিং

প্রুনিং বা ছাটাইকরণ ফলচাষে একটি অন্যতম করণীয় কাজ।

প্রুনিং বা ছাটাইকরণ ফলচাষে একটি অন্যতম করণীয় কাজ। চারা রোপণের পর প্রাথমিক অবস্থায় কিছু ছাটাই করা দরকার যাতে গাছের একটি সুষ্ঠ ও সবল কাঠামো গড়ে উঠে। পরবর্তীতে কোনো কোনো ফল গাছে ছাটাই করতে হয। যেমন কুল গাছের ফল সংগ্রহের পর সব ডালপালা কেটে ফেলতে হয়। এতে ফলের মান ও ফলন উভয়েই বাড়ে। তেমনিভাবে আঙুর, লেবু, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি ফল গাছে নিয়মিত ও পরিমিত ছাটাই করা প্রয়োজন।

অনেক সময় যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও গাছ ফলবর্তী না হলে শিকড় ছাটাই করে এ সমস্যা দূর করা যায়। গাছ যে পরিমাণ জায়গায় বিস্তৃতি লাভ করে সেই জায়গা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে অথবা লাঙ্গল দিয়ে গভীরভাবে চাষ করে শিকড় ছাটাই করা হয়।

আন্ত চাষ

ফল বাগানের মাটিতে রস সংরক্ষণের জন্য বর্ষার প্রথমে ও শেষে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করলে উপকার পাওয়া যায়। চাষ করলে গাছের পাতা ও আবর্জনা মাটির সাথে মিশে এবং পানি খুব সহজেই মাটিতে প্রবেশ করে এবং অনেকদিন ধরে তা মাটিতে সংরক্ষিত থাকে। যার দরুন মাটির জৈব পর্দাথের পরিমাণ বাড়ার সাথে পানি ধারণ ক্ষমতা ও খাদ্য উপাদানের পরিমাণ বাড়ে।

পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন

বিভিন্ন সময় ফল বাগানে বিভিন্ন পোকা মাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ দেখা যায়। এ সব পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমনের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়াও প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পোকামাকড় ও রোগ বালাই প্রতিরোধকারী জাত ব্যবহার করতে হবে।

অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণ

গাছ ফল দেয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পরও যদি একেবারে অথবা আকাংখিত পরিমাণ ফল না দেয় তাহলে সেই গাছকে অফলন্ত গাছ বলা হয়। অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের প্রক্রিয়া সমূহ আলোচনা করার আগে ফলন্ত ও অফলন্ত গাছ কী তা আমাদের জানা উচিত।

ফলন্ত গাছ

গাছ নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি পরিমিত ফুল, ফল ধারণ করে এবং সংগ্রহ পর্যন্ত গাছ ফল বহন করে

কোনো গাছ নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি পরিমিত ফুল ও ফল ধারণ করে এবং ফল সংগ্রহ পর্যন্ত গাছ ফল বহন করে তখন তাকে আমরা ফলন্ত গাছ বলি। গাছে ফুলের মুকুল বিকশিত হওয়ার পর তা প্রস্ফুটিত হয় এবং পরাগায়ন ও নিষিক্ত করণের পর ফুলের গর্ভাশয় স্ফীত হয়ে ফলে পরিনত হয়। ফলন্ত গাছে শুধু প্রচুর পরিমাণ ফুল ফলই ধরে না, ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত তা বহন করে। এটি ফলন্ত গাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখি অনেক গাছে প্রচুর পরিমাণ ফুল ও ফল ধরে। কিন্তু সেই ফল পরিপক্ক হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। এ ক্ষেত্রে গাছটিকে ফলন্ত বলা যাবে না। কারণ গাছটি যে ফল বহন করেছিল তা পরিপক্কতার আগেই ঝরে পড়েছে এবং তা চাষী অথবা ভোক্তার কোনো কাজেই লাগেনি।

অফলন্ত গাছ

কোনো গাছ ফল দেয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি ফল না দেয়, ফুল, ফল ঝরে পড়ে, কম পরিমাণ ফল ধারণ করে অথবা অনিয়মিত ও ত্রুটি যুক্ত ফল দেয় তখন সেই ফল গাছকে আমরা অফলন্ত গাছ বলি।

অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের পদক্ষেপ সমুহ

অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণ করা বেশ কষ্টসাধ্য। তবে আগে থেকে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে এ সমস্যা অনেকগুলো এড়ানো যেতে পারে। অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের কয়েকটি পদক্ষেপ নিচে আলোচনা করা হলোঃ

(১) বিপরীত লিঙ্গের গাছ জন্মান এবং কৃত্রিম পরাগায়ন (Growing plants of opposite sex and artificial pollination) t যে সব গাছে স্থতী ও পুরুষ ফুল ভিন্ন ভিন্ন গাছে হয় যেমন তাল, খেজুর, পেঁপে গাছের ক্ষেত্রে বাগানে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে স্থতী ও পুরুষ গাছ লাগিয়ে অফলন্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়েও এ সমস্যার সমাধান করা যায়। যেমন পেঁপে গাছে কৃত্রিম উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে ফল ধারণ করানো যায়।

(৪) সুষম সার ব্যবহার (Use of balanced fertilizers) ঃ ফল বাগানে সুষম সার ব্যবহার করে গাছের বৃদ্ধি এবং ফুল-ফল বিকাশকে সঠিক পর্যায়ে রাখা যায়।

(৫) পরিচর্যা ঃ অনেক সময় অবহেলা ও পরিচর্যার অভাবে গাছে ফল ধরা বন্ধ হয়ে যায়। পরিচ্ছন্নতা, আগাছা দমন, রোগ বালাই দমন করে ও যথা সময়ে সেচ প্রদান সহ যথোপযুক্ত পরিচর্যা করে গাছকে ফলবর্তী করা যায়।

(৬) গাছে কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনের সঠিক অনুপাত সংরক্ষণ (Maintaining right C:N ratio in the plants) ঃ গাছে কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনের সঠিক অনুপাত ফুল ও ফল ধারনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ জন্য গাছে উক্ত খাদ্য দুটির সঠিক অনুপাত বজায় রাখা উচিত। গাছের মূল ছাটাই, বাকল ছাটাই, ফুল-ফল পাতলাকরণ প্রভৃতি উদ্যানতাত্ত্বিক কৌশল অবলম্বন করে গাছে কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনের সঠিক উপাদান সংরক্ষণ করে অফলন্ত গাছকে ফলবর্তী করা যায়।

(৭) মৌমাছি পালন (Bee keeping) ঃ বাগানে মৌমাছি পালন পরাগায়নে সাহায্য করে এবং গাছে ফল ধারণ বেশি হয় ও গাছ প্রতি ফলন বাড়ে।

(৮) হরমোন প্রয়োগ (Application of hormones) ঃ গাছে হরমোনের অসাম্যতার জন্য ফুল-ফল ঝরে পড়ে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের হরমোন যেমন NAA অত্যন্ত কম মাত্রায় গাছে প্রয়োগে ফুল ধারণ ত্বরান্বিত করে, ফল ঝরা রোধ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফলের আকার আকৃতি বৃদ্ধি করে।

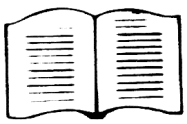

সারমর্ম ঃ জমিতে চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত ফল গাছের যত্ন নেয়ার জন্য যেসব কাজ করা হয় সেগুলোকে আন্ত পরিচর্যা বলে। যেমন– আগাছা দমন, আন্ত কর্ষণ, সেচ, পানি নিষ্কাশণ, সার প্রয়োগ, অঙ্গঁ ছাটাই, সাথী ফসলের চাষ, রোগ বালাই দমন ইত্যাদি। ফল গাছ বিভিন্ন কারণে অফলন্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ব্যবস্থা যেমন বাগানে বিপরীত লিঙ্গেঁর গাছ জন্মান, কৃত্রিম পরাগায়ন, উপযুক্ত পরিচর্যা, সুষম সার ব্যবহার, গাছের শর্করা ও নাইট্রোজেনের সঠিক অনুপাত সংরক্ষণ, শিকড় ছাটাই, বাকল ছাটাই, হরমোন প্রয়োগ, ইত্যাদি গ্রহণ করে অফলন্ত গাছকে ফলন্ত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিম্ন লিখিত কোন্‌টি আন্ত পরিচর্যা নয়?
- (ক) আগাছা দমন
- (খ) সেচ
- (গ) গাছ রোপণ
- (ঘ) অঙ্গ ছাটাই

২। কোনো গাছ ফল দেয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি ফল না দেয় তাকে কী বলে?
- (ক) ফলন্ত গাছ বলে
- (খ) অফলন্ত গাছ বলে
- (গ) ফলবহনকারী গাছ বলে
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়

৩। নিচের কোন্‌টি অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের উপায় নয়?
- (ক) শিকড় ছাটাই
- (খ) বাকল ছাটাই
- (গ) ফুল-ফল পাতলাকরণ
- (ঘ) ট্রেনিং

পাঠ ৫.২ ফসল পর্যায় ও সাথী ফসলের চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ফসল পর্যায় কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফল চাষে ফসল পর্যায়ের ব্যবহার ব্যাখা করতে পারবেন।
- সাথী ফসল কী তা ব্যাখা করতে পারবেন।
- ফল চাষে সাথী ফসলের চাষ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

ফসল পর্যায়

ফল চাষে ফসল পর্যায় ও সাথী ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে। তবে ফসল পর্যায় ব্যবহার করা হয় স্বল্প মেয়াদী ফসলের ক্ষেত্রে। কিন্তু সাথী ফসলের চাষ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উভয় ধরনের ফল চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে জমিতে চাষ করাকে ফসল পর্যায় বলা হয়।

একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে জমিতে চাষ করাকে ফসল পর্যায় বলে।

ফসল পর্যায় কেন ব্যবহার করা হয়?

বিভিন্ন ফসলের খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন রকম। কিছু কিছু ফসল মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপাদান আহরণ করে। অপর দিকে কিছু কিছু ফসল অল্প পরিমাণ খাদ্য উপাদান মাটি থেকে আহরণ করে। আবার কিছু ফসল আছে যেগুলো মাটি থেকে বিশেষ উপাদান প্রচুর পরিমানে আহরণ করে। ফলে মাটিতে ওই উপাদানের অভাব দেখা যায়। তাছাড়া কিছু কিছু ফসল মাটির উপরের স্তর থেকে খাদ্য উপাদান আহরণ করে। অপর দিকে কোনো কোনো ফসল মাটির খুব গভীর থেকে খাদ্য উপাদান আহরণ করে। এ ছাড়াও বিশেষ কোনো ফসলের সাথে বিশেষ বিশেষ আগাছা জন্মানো এবং পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই আক্রমনের সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্য দেখা যায় যে একই জমিতে বছরের পর বছর একই ফসল জন্মালে মাটিতে বিশেষ কোনো খাদ্য উপাদানের অভাব দেখা যায়। সাথে সাথে বিশেষ আগাছা, পোকা-মাকড় ও রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ জন্য মাটির উর্বরতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে বেশি করে ফসল উৎপাদন এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য জমিতে ফসল পর্যায় ব্যবহার করা হয়।

ফসল পর্যায়ের মূলনীতি

জমিতে ফসল পর্যায় গ্রহণ করতে কিছু মৌলিক নিয়মাবলী গ্রহণ করা উচিত। ফসল পর্যায় গ্রহণের মৌলিক নীতিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

ফসল পর্যায়ের মূলনীতি হলো বেশি খাদ্য উপাদান গ্রহণকরী গাছের পর কম খাদ্য উপাদান গ্রহণকারী গাছের চাষ, গভীর মূলী ফসলের পর অগভীর মূলী ফসলের চাষ, অধিক চাষ পছন্দকারী ফসলের পর কম চাষ পছন্দকারী ফসলের চাষ, জমি কিছু দিনের জন্য খালি রাখা, সবুজ সারের চাষ, স্থানীয় জলবায় , শ্রমিক প্রাপ্যতা ইত্যাদি।

১। যে সকল ফসল মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে (Gross feeder) সেগুলোর পরে যে সব ফসল অল্প খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে (Poor feeder) সেগুলোর চাষ করতে হবে।

২। যে সকল ফসল মাটির গভীর থেকে খাদ্য উপাদান আহরণ করে সে সকল ফসল চাষের পর যে সকল ফসল মাটির উপরের স্তর থেকে খাবার গ্রহণ করে সে সকল ফসলের চাষ করতে হবে। অর্থাৎ গভীর মূলী ফসল চাষের পর অগভীর মূলী ফসলের চাষ করতে হবে।

৩। অধিক চাষ পছন্দকারী ফসল চাষের পর কম চাষ পছন্দকারী ফসলের চাষ করতে হবে।

৪। জমিতে অনবরত ফসল চাষ না করে ২-৩ বৎসর পর কমপক্ষে এক মৌসুমের জন্য খালি রাখতে হবে।

৫। জমিতে জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সবুজ সার চাষ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬। স্থানীয় জলবায়ু, মাটি, শ্রমিক-প্রাপ্যতা, বাজার ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ফসল পর্যায়ের জন্য ফসল নির্বাচন করতে হবে।

৭। ফসল পর্যায় তৈরির সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন খামারের শ্রমিকদের সঠিকভাবে সঠিক সময়ে কাজ দেয়া যায়।

সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদী ফসল যেমন আম, জাম, কাঠাল, নারিকেল ইত্যাদি ৫০-৬০ বৎসর মাঠে থাকে বিধায় এসব ফসল চাষের ক্ষেত্রে ফসল পর্যায় ব্যবহার করা কঠিন। কিন্তু স্বল্প মেয়াদী ফসল যেমন কলা, পেপে, তরমুজ, আনারস প্রভৃতির জন্য সুনির্দিষ্ট ফসল পর্যায় ব্যবহার করা উচিত। সারণি ১-এ আহমেদ (১৯৭৬) এর মতানুযায়ী উচ্চ জমিতে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের একটি ফসল পর্যায়ের নমুনা দেয়া হলো।

সারণি ১ঃ একটি ফসল পর্যায়ের নমুনা

শস্য	সময়
কলা (১ বৎসর)	বৈশাখ(১ম বছর) - বৈশাখ (২য় বছর)
সবুজ সার (৩ মাস)	জৈষ্ঠ্য (২য় বছর)- শ্রাবণ (২য় বছর)
আনারস (২ বৎসর)	ভাদ্র (২য় বছর)-শ্রাবণ (৪র্থ বছর)
মুড়ি আনারস (১ বৎসর)	শ্রাবণ (৪র্থ বছর)-ভাদ্র (৫ম বছর)
শীতকালীন সবজী বা ডাল (৬ মাস)	আশ্বিন (৫ম বছর)-ফাগুন (৫ম বছর)
পেঁপে (১ বৎসর)	চৈত্র (৫ম বছর)-চৈত্র (৬ষ্ঠ বছর)

সাথী ফসল

প্রধান ফসলের মাঝে যখন কোনো অস্থায়ী ফসল চাষ করা হয় তখন অস্থায়ী ফসলটিকে সাথী ফসল বা আন্ত ফসল বলে। সাথী ফসল চাষে বাগান থেকে স্বল্প সময়ে কিছু আগাম উপার্জন করা যায়।

যখন কোনো প্রধান ফসলের মাঝে কোনো অস্থায়ী ফসল চাষ করা হয় তখন এ অস্থায়ী ফসলটিকে সাথী ফসল বা আন্ত ফসল বলা হয়। ফল বাগানে গাছ লাগানোর পর এর পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বেশ কিছু সময়ের দরকার হয়। যার দরুন দু-গাছের মাঝখানের জমি খালি থাকে। এ খালি জমিতে অস্থায়ী ফসল লাগিয়ে বাগান থেকে কিছু আগাম উপার্জন করা যায়। এ অস্থায়ী ফসলটি হলো সাথী ফসল। যেমন কলা ও পেঁপে বাগানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, সরিষা ও ডালজাতীয় সাথী ফসলের চাষ করা হয়। অপর দিকে দীর্ঘ মেয়াদী ফল গাছের বেলায় কলা, পেঁপে, লেবু, আনারস ইত্যাদি ফলজাতীয় গাছকে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়।

সাথী ফসল নির্বাচনের নিয়মাবলী

সাথী ফসল নির্বাচনের নিয়ম হলো- সাথী ফসল মূল ফসলের সাথে পানি ও খাদ্য উপাদানের জন্য প্রতিযোগিতা করবে না, পোকা মাকড় বা রোগ বালাইকে আশ্রয় দিবেনা, আন্ত পরিচর্যায় বাধা দিবেনা, মূল ফসলের ফুল-ফল ধারনে কোন ক্ষতি করবে না।

১। সাথী ফসল কোনো সময়ই মূল বা প্রধান ফসলের সাথে পানি ও খাদ্য উপাদনের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না।

২। সাথী ফসল বাগানে পোকা-মাকড় ও রোগ বালাইয়ের উৎস হিসেবে কাজ করবে না।

৩। সাথী ফসল মূল ফসলের জন্য আন্ত পরিচর্যা যেমন- প্রুনিং, সেচ, ঔষধ ছিটানো, সার প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

৪। মূল ফসলের ফুল-ফল ধারণে সাথী ফসল কোনো ক্ষতি করবে না।

৫। সাধারণভাবে সাথী ফসল হিসেবে বহুবর্ষজীবী ফসল অপেক্ষা একবর্ষজীবী ফসলকে প্রধান্য দেয়া উচিত

৬। যেহেতু ফল বাগান থেকে আগাম আর্থিক সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাথী ফসল চাষ করা হয় সেহেতু সাথী ফসল হিসেবে তুলনামুলকভাবে দামী ফসলকে নির্বাচন করতে হবে। এ জন্য স্থানীয় বাজারে চাহিদা ও দামের ওপর নির্ভর করে সাথী ফসল নির্বাচন করা উচিত।

৭। সাধারণভাবে লিগিউম বা সীম জাতীয় ফসল যাদের ভালো বাজার মূল্য আছে সেগুলোর চাষ করা উচিত। কারণ সীম জাতীয় ফসল আর্থিক সহায়তার সাথে সাথে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়।

৮। সাথী ফসল ম ল ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কেটে ফেলতে হবে। আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদী ফল বাগানে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি, তেল ও ডালজাতীয় ফসলের চাষ করা হয়। অন্য দিকে দীর্ঘ মেয়াদী ফল বাগানে স্বল্প মেয়াদী ফল গাছ যেমন, পেঁপে কলা, আনারস লেবু, আতা, শরীফা, ইত্যাদি ফলের চাষ করা হয়।

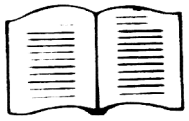

সারমর্ম ঃ একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে চাষ করাকে ফসল পর্যায় বলে। ফসল পর্যায় তৈরি করার সময় কিছু মৌলিক নীতি অবলম্বন করা হয়। যেমন– প্রচুর খাদ্য উপাদান গ্রহণকারী ফসলের পর কম খাদ্য উপাদান গ্রহণকারী ফসলের চাষ, গভীর মূলী ফসলের পর অগভীর মূলী ফসলের চাষ, বেশি চাষ পছন্দকারী ফসলের পর কম চাষ পছন্দকারী ফসলের চাষ, ২-৩ বৎসর পর জমি কম পক্ষে এক মৌসুমের জন্য খালি রাখা, জমিতে সবুজ সারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। কোনো দীর্ঘ মেয়াদী ফসলের মাঝে স্বল্প মেয়াদী ফসলের চাষ করলে,

স্বল্প মেয়াদী ফসলকে সাথী ফসল বা আন্ত ফসল বলা হয়। সাথী ফসল কখনই মূল ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না, পোকা মাকড়ের উৎস হিসেবে কাজ করবে না ইত্যাদি নীতি মেনে চলা উচিত। মূল ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সাথী ফসল সরিয়ে ফেলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। একই জমিতে একই ফসল চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে চাষ করাকে কী বলা হয়?
- ক) ফসল পর্যায় বলে
- খ) আন্ত ফসল বলে
- গ) সাথীফসল বলে
- ঘ) আন্ত কর্ষণ বলে

২। কোন্‌টি ফসল পর্যায়ের নীতি নয়?
- ক) গভীর মূলী ফসলের পর অগভীর মূলী ফসলের চাষ।
- খ) বেশি চাষ পছন্দকারী ফসলের পর কম চাষ পছন্দকারী ফসলের চাষ।
- গ) জমিতে সবুজ সার চাষের ব্যবস্থা করা।
- ঘ) একই জমিতে একই ফসলের বার বার চাষ করা।

৩। সাথী ফসল কীভাবে চাষ করা হয়?
- (ক) প্রধান ফসলের সাথে চাষ করা হয়।
- (খ) দুই ফসলের মাঝের সময়ে চাষ করা হয়।
- (গ) মূল ফসল জমিতে লাগানোর পূর্বে চাষ করা হয়।
- (ঘ) মূল ফসল জমিতে চাষের পরে চাষ করা হয়।

৪। সাথী ফসল জমি থেকে কখন সরিয়ে ফেলতে হবে?
- (ক) যখন প্রধান ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না।
- (খ) যখন মূল ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।
- (গ) যখন এক বৎসর বয়স হবে।
- (ঘ) যখন পাঁচ বৎসর বয়স হবে।

পাঠ ৫.৩ ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ফলের পরিপক্কতা ও পাকার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফল সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।
- ফল বাছাই কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফল বাজারজাতকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

ফলের পরিপক্কতা (Maturity)

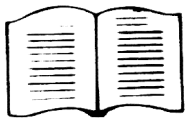

ফল যথাযথ পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করা উচিত। ফল সংগ্রহের পর তা ভালোভাবে বাছাই করতে হবে। বাছাইয়ের সময় কাটা ফাটা বা থেতলানো ফল আলাদা করে ফেলতে হবে। তারপর ভালো ফল আকার অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করে বাজারজাত করতে হবে।

ফল যখন আকার, আয়তন এবং বয়সে সর্বশেষ অবস্থায় পৌছে তখন তাকে পরিপক্কতা বলে।

ফলের পরিপক্কতা এমন একটি অবস্থা যখন ফল আকার, আয়তন এবং বয়সে সর্বশেষ অবস্থায় পৌছে অর্থাৎ এর পর ফল আর আকার ও আয়তনে বৃদ্ধি পায় না। কিছু লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্কতা নিরূপণ করা যায়। এই লক্ষণগুলোকে ফলের পরিপক্কতার লক্ষণ বা গধঃৎরঃু রহফবী বলা হয়। ফল ধারন থেকে দিবস সংখ্যা, আকার, আকৃতি, রং, বুনট, আপেক্ষিক গুরুত্ব, ষ্টার্চের পরিমাণ, দ্রবণীয় শক্ত পদার্থ, চিনি অত্নর হার এবং চর্বির পরিমাণ ইত্যাদি পরিপক্কতার লক্ষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ফল পাকা (Ripening of fruits)

ফল পাকার অর্থ হলো পরিপক্কতার পর ফলের গুণগত পরিবর্তন যার মাধ্যমে ফল ভক্ষণযোগ্য বা খাবার উপযোগী হয়। ফল পাকার সাথে সাথে ফলের রং, গন্ধ ও বুনটের পরিবর্তন হয় যার দরুন ফল ভোক্তার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

ফল সংগ্রহ

ফল যথাযথভাবে পরিপক্ক হলে গাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত। ফল সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে ফল আঘাত না পায় বা থেতলিয়ে না যায়।

ফল পরিপক্ক হলে পরেই তা গাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত। অপরিপক্ক ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করলে গুণাগুণ বজায় থাকে না। এ জন্য চাষীরা ফলের সঠিক মূল্য পায় না। আমাদের দেশে সাধারণত মই, ঝুড়ি, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি দ্বারা গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়। গাছ থেকে সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ফল আঘাত না পায় বা থেতলিয়ে না যায়। যে সব ফল সংগ্রহকারীর নাগালের বাইরে থাকে সেগুলো উচু মই বা প্লাট ফরম মই ব্যবহার করে সংগ্রহ করা উচিত। হাত দ্বারা ফল সংগ্রহের সময় বোটাসহ ফল পাড়া উচিত।

ফল বাছাই

বাজারে ফলের ভালো দাম পেতে হলে খারাপ ও ভালো ফল বাছাই করে নিতে হবে। এরপর ভালোগুলো আকার ও মান অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে।

ফল সংগ্রহের সময় কেটে, ফেটে অথবা থেতলিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও ফল সংগ্রহের সময় ছোট, মাঝারী, বড়, পাকা, কাচা বা অতিরিক্ত পাকা প্রভৃতি ফল একসঙ্গে সংগ্রহ করা হয়। আঘাত প্রাপ্ত বা অতিরিক্ত পাকা ফল বাছাই না করলে ভালো ফলও বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পচে যেতে পারে। এ জন্য গাছ থেকে সংগ্রহের পর পরই ভালো ফলকে আঘাত প্রাপ্ত ফল থেকে বাছাই করে নিতে হবে। বাছাইয়ের পর ফলের আকার ও মান অনুযায়ী ফল শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। কারণ ভালো ফল বেশি অর্থায়নে সাহায্য করে।

ফল বাজারজাতকরণ (Marketing of fruits)

আমাদের দেশে ফল বাজারজাতকরণ একটি জটিল ব্যবস্থা। এ দেশে ফল বাজারজাতকরণের প্রধান সমস্যা হলো মধ্যস্বত্ত্ব ভোগীদের প্রভাব, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাব, ফল গুদামজাতকরণের অভাব ইত্যাদি।

আমাদের দেশে ফল বাজারজাতকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। ফল সংগ্রহ করার পর ঠিকভাবে বাজারজাত করতে না পারলে ফল চাষীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হন। ফলকে সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত করতে পারলে ফল চাষী এবং ভোক্তা উভয়েই লাভবান হন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু ফল বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। যার দরুন চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফলের সঠিক মূল্য পান না। অপর দিকে ভোক্তাদের অধিক মূল্যে ফল কিনতে হয়। এর জন্য ফল বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি যেমন দালাল, ফড়িয়া ইত্যাদি মধ্যস্বত্ব ভোগীদের প্রভাব, সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, ফলের সুষ্ঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অভাব, ফল গুদাম জাতকরণের অভাব ইত্যাদি কারণ দায়ী। ফল বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নতকরনের জন্য সঠিক জাতের ফল উৎপাদন করতে হবে, ফল সংগ্রহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, ফলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে, ফল চাষীদের সমবায়ের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করতে হবে, ফল চাষে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, উৎপাদন এলাকার সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে, রেলওয়ে, ট্রাক, ষ্টীমার ইত্যাদিতে হিমাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। ফড়িয়া, দালাল ইত্যাদি মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। অন্যান্য ফসলের ন্যায় ফলের ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য প্রচার মাধ্যম তথা খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে প্রচারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ফল বহনকারী যানবাহন সম হকে হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদির বাইরে রাখতে হবে। সর্বোপরি ফলজাত দ্রব্য তথা জ্যাম, জেলী, স্কোয়াশ, শরবত ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

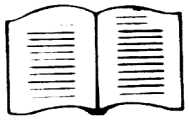

সারমর্ম ঃ ফল যখন আকার আয়তন ও বয়সে সর্বশেষ স্তরে পৌছে তখন তাকে পরিপক্কতা বলা হয়। পাকা ফল বলতে আমরা সেই ফলকে বুঝি যেটি পরিপক্কতার পর গুণগত পরিবর্তনের দরুন খাবার উপযোগী হয়। যে সকল লক্ষণ দেখে ফল পরিপক্ক হয়েছে বোঝা যায় সেই সকল লক্ষণকে পরিপক্কতার লক্ষণ বলা হয়। পরিপক্ক ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত। সংগ্রহের পর ফল বাছাই করে মান অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে হয়। ফল বাছাই ও শ্রেণিবিন্যাসের পরবর্তী স্তর হলো বাজারজাতকরণ। আমাদের দেশে ফল বাজারজাতকরণ খুব জটিল প্রক্রিয়া এবং দালাল, ফড়িয়া ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমবায় ব্যবস্থা, ফল চাষের জন্য ঋণ, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা, হিমাগার স্থাপন, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের প্রভাব খর্ব করা, আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফলজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ফল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোন্ অবস্থায় ফলকে পরিপক্ক বলা যাবে?
- ক) ফল যখন আকারে আর বৃদ্ধি পায় না
- খ) ফলের যখন রং বদলায়
- গ) ফল যখন আয়তনে আর বৃদ্ধি পায় না
- ঘ) ফল যখন আকারে ও আয়তনে আর বৃদ্ধি পায় না

২। কোন্ অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা উচিত?
- ক) নিজে নিজেই গাছ থেকে ফল পড়ে যেতে থাকলে
- খ) ফলের রং বদলাতে থাকলে
- গ) কিছুটা অপরিপক্ক অবস্থায়
- ঘ) সম্পর্ন পরিপক্ক অবস্থায়।

৩। ফল বাছাই এর ক্ষেত্রে কোন্ বাক্যটি প্রযোজ্য?
- ক) ফল সংগ্রহের পর সব ফলকে একত্রে রাখা হয়।
- খ) ফল বাছাই করলে বেশী লাভবান হওয়া যায় না।
- গ) ফল বাছাই না করলে ভালো ফলও রোগাক্রান্ত হয়।
- ঘ) ফল পারার আগেই বাছাই করতে হবে।

শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক) যে লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্কতা নিরূপণ করা হয় তাকে ..... লক্ষণ বলা হয়।

খ) পরিপক্কতার পর ফলের গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ফল যখন ভক্ষণযোগ্য হয় তাকে ফল ..... বলে।

গ) ..... ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত।

ঘ) বাছাইয়ের পর ..... ও ..... অনুযায়ী ফলে শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে।

পাঠ ৫.৪ সংগ্রহোত্তর ফলের শারীরবৃত্তীয় ও সংরক্ষণের নীতিমালা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সংগ্রহোত্তর ফলের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় দিকসমুহ আলোচনা করতে পারবেন।
- ফল সংরক্ষণের নীতিমালাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

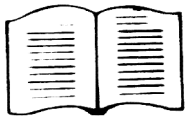

সংগ্রহোত্তর ফলের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় দিক (Post harvest physiology of fruit) ঃ

ফল পরিপক্কতার পর তা গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ক ফল সংগ্রহের পর ফলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। এসব শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের সাথে সাথে ফল খাবার উপযোগী হয়। গাছের সংগ্রহোত্তর শারীরবৃত্তীয় দিকের মধ্যে অন্যতম হলো শ্বসন। শ্বসনের মাধ্যমে ফলের সরল সুগার জারিত হয়ে পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড এবং তাপের সৃষ্টি করে। প্রায় সব ফল পাকার সাথে সাথে শ্বসন বাড়ে। পাকার সময় শ্বসনের হার অনুযায়ী ফলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো-

(ক) ক্লাইমেকটারিক ফল- এ সব ফল পাকার সময় হঠাৎ শ্বসনের হার বেড়ে যায় এবং ফল বার্ধক্যে উপনীত ও নষ্ট হয়ে পড়ে। কলা, পেঁপে, আম, পেয়ারা, কাঠাল, ডুমুর, সফেদা ইত্যাদি ক্লাইমেকটারিক ফলের উদাহরণ।

(খ) নন-ক্লাইমেকটারিক ফল- পাকার সাথে সাথে শ্বসনের হার আস্তে আস্তে কমে। লিচু, আনারস, আঙ্গুর, ডালিম, এলাচী, লেবু, পাতি লেবু, কমলা লেবু ইত্যাদি নন ক্লাইমেকটারিক ফলের উদাহরণ। শ্বসনের হার কোনো ফলের সংগ্রহোত্তর আয়ুষ্কাল নির্ণয়ের একটি অন্যতম পরিমাপক। সংগ্রহোত্তর ফলের আয়ুষ্কাল বাড়ানোর জন্য অবশ্যই শ্বসনের হার কমাতে হবে।

ফল পাকা (Fruit ripening) ঃ

ফল পাকার সাথে সাথে এর গুণগত পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ, পেক-টিনস, কার্বোহাইড্রেটস, এসিডস এবং ফেনোলিকস পরিবর্তিত হয়।

গাছে থাকা অবস্থায় অথবা সংগ্রহের পর ফল পাকতে পারে। ফল পাকা শুরুর সাথে সাথে ফলের গুণগত পরিবর্তন যেমন রং, গন্ধ এবং বুনট পরিবর্তিত হয়ে তা ভোক্তার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। এ সব গুণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে ফলের গঠনের পরিবর্তন ঘটে। যেমন রঞ্জক পদার্থ, পেকটিনস, কার্বোহাইড্রেটস, এসিডস, ফেনোলিকস প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়। পরিপক্ক ফল স্বাদে এবং গন্ধে ভালো হয়। এ জন্য পরিপক্ক ফল গাছ থেকে পাড়া উচিত। পাকার পর ফল তার নিজস্ব রং ধারণ করে। অদ্রবণীয় প্রো-প্রেকটিন দ্রবণীয় পেকটিনে রূপান্তরিত হয়ে ফল নরম হয়। ফল পাকার সময় ষ্টার্চ ভেঙ্গে সরল চিনি যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, সুক্রোজ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হওয়ার দরুন ফল মিষ্টি হয় এবং একই সাথে ফলে জৈব এসিড ও ফেনোলিক্সের পরিমাণ কমে। যার দরুন ফলের ম্লত্ব ও কসলাভাব (Astringency) কমে এবং ফল ভোক্তার নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। ফল পাকার সময় কিছু সুগন্ধযুক্ত উদ্বায়ু পদার্থ তৈরি হয় যা ফলকে তার নিজস্ব গন্ধ দেয়।

ইথিলিন

ইথিলিন ফল পাকানোর হরমোন হিসেবে পরিচিত। ফল পরি-পক্কতার সাথে সাথে প্রচুর পরিমান ইথিলিন তৈরি হয় এবং ফল পাকা ত্বরান্বিত করে।

ইথিলিন ফল পাকানোর হরমোন হিসেবে পরিচিত। এটি একটি সরল জৈব পদার্থ যা গাছের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় এক বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং গাছের প্রায় সব টিস্যুতে এটি উৎপাদিত হয়। ইথিলিন প্রয়োগের মাধ্যেমে ফল পাকানো একটি পুরাতন পদ্ধতি। পরিপক্কতার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ ইথিলিন উৎপাদিত হয় যা ফলের স্বসন ও পাকানোকে ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ থেকে ইথিলিন উৎপাদিত হয় যেগুলো ব্যবহার করে ফল- পাকানা ত্বরান্বিত করা যায়। ইথরেল, ইথিফন ইত্যাদি ইথিলিন উৎপাদনক্ষম রাসায়নিক যৌগ ছিটিয়ে ফল পাকানো যায়।

ফল সংরক্ষণের নীতিমালা

ফলকে সাধারণত দুই ভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যথা (১) অস্থায়ী সংরক্ষণ এবং (২) স্থায়ী সংরক্ষণ।

১। অস্থায়ীভাবে ফল সংরক্ষণের নীতিমালাসমূহ নিচে বিস্তারিতভাবে দেয়া হলোঃ

ক) নিম্ন তাপমাত্রা ঃ নিম্ন বা কম তাপমাত্রায় ফল সংরক্ষণ করলে ফলের ভিতর শ্বসন, প্রশ্বেদন ও এনজাইমিক কার্যক্রম কম হয়। সাথে সাথে রোগজীবাণু তথা বিভিন্ন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি কমে যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রায় ফল ১-২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত রাখা যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রার সাথে সাথে আর্দ্রতা বাড়ালে ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে।

ফলকে অস্থায়ী এবং স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। নিম্ন তাপমাত্রা, জীবাণুনাশক ব্যবহার, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পাস্তুরাইজেশন ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে ফল অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

খ) জীবাণুনাশক ব্যবহার ঃ চিনি, লবণ এবং ভিনেগারের হালকা দ্রবণ ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

গ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ ফল ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখলে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ কমে এবং ফল অধিক সময় ধরে সংরক্ষণ করা যায়।

ঘ) পাস্তুরাইজেশন বা পাস্তুরিকরণ (Pasteurization)t ফলের রস এবং পানীয় ৮০° সে. তাপমাত্রায় পাস্তুরীকরণ করে ৩-৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

২। স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের নীতিমালাসমূহ নিচে দেয়া হলো ঃ

ফলজাত বিভিন্ন দ্রব্য ১-৩ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। স্থায়ীভাবে ফল সংরক্ষণের নীতিমালা ও পদ্ধতি নিচে দেয়া হলোঃ

ক) চিনি, লবণ ও ভিনেগার ব্যবহার ঃ বিভিন্ন পরিমাণে চিনি, লবণ ও ভিনেগার ব্যবহার করে ফল সংরক্ষণ করা যায়। যে কোনো ধরনের ফলজাত দ্রব্য যাতে ৬৫% এর উপরে চিনি থাকে তা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। জ্যাম, জেলী ইত্যাদি এ পদ্ধতি ও নীতি ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা হয়।

র) লবণ ঃ শতকরা ১৫-২০% ভাগ লবণের দ্রবণ ব্যবহার করে ফলজাত দ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। লেবু, আম ইত্যাদির আচার এ নীতি অবলম্বন করে সংরক্ষণ করা হয়।

রর) ভিনেগার ঃ শতকরা ১-৪ ভাগ এসিটিক এসিডের দ্রবণ ব্যবহার করে ফলজাত দ্রব্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

খ) বিভিন্ন সংরক্ষণকারী দ্রব্যের ব্যবহার (Use of preservatives) ঃ পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট, সোডিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট এবং সোডিয়াম বেনজয়েট ইত্যাদি সংরক্ষণ-কারী দ্রব্য ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে ফলজাত দ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়।

বিভিন্ন ফলজাত দ্রব্য ১-৩ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। চিনি, লবণ, ভিনেগার, বিভিন্ন সংরক্ষণকারী দ্রব্য, পানির পরিমান হ্রাস, গাজানো, টিনজাতকরণ, ডীপ ফ্রিজিং ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে ফল স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

গ) শুকিয়ে বা পানির পরিমাণ কমিয়ে সংরক্ষণ ঃ বিভিন্ন ফল বা ফলজাত দ্রব্যকে একেবারে শুকিয়ে বা পানির পরিমাণ কমিয়ে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন কিসমিস, পেস্তা বাদাম, কাজু বাদাম ইত্যাদি শুকিয়ে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

ঘ) গাজানো (Fermentation) ঃ বিভিন্ন ধরনের উপকারী ইষ্ট (yeast) ব্যবহার করে ফলের রসকে গাজিয়ে মদ অথবা ভিনেগার তৈরি করা হয় যা অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ঙ) টিনজাত করা (Canning) ঃ ভালোভাবে টিনজাত করলে ফলকে ১-৩ বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে টাটকা ফলকে চিনির দ্রবণে টিনজাত করা হয়। আম, আনারস, লিচু, পীচ, নাশপাতি ইত্যাদি ফল টিনজাত করে সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণত টিনজাত করার পর জীবাণুমুক্ত করার জন্য তা পাস্তুরাইজেশন করা হয়।

চ) **ডীপ ফ্রিজিং ঃ** ফল বা ফলজাত দ্রব্যকে অত্যন্ত ঠান্ডা তাপমাত্রায় অর্থাৎ ২০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়।

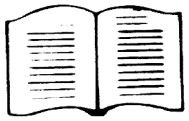

সারমর্মঃ সংগ্রহোত্তর ফলে বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। সংগ্রহোত্তর ফলে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে শ্বসন অন্যতম। শ্বসনের ওপর নির্ভর করে ফলসম হকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো ক্লাইমেকটারিক ফল ও নন-ক্লাইমেকটারিক ফল। পরিপক্ক ফল সংগ্রহের পর পাকতে শুরু করে। ফল পাকার সাথে সাথে এর গুণগত পরিবর্তন যেমন রং, গন্ধ ও বুনট পরিবর্তিত হয়। ইথিলিন ফল পাকার হরমোন হিসেবে পরিচিত। ফল পরিপক্কতার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে ইথিলিন উৎপাদিত হয় যা ফলের শ্বসন ও পাকানোকে ত্বরান্বিত করে। ফল সাধারণত অস্থায়ী এবং স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। অস্থায়ীভাবে ফল সংরক্ষণের নীতিমালা হলো নিম্ন তাপমাত্রা, জীবাণুনাশক ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পাস্তুরাইজেশন। স্থায়ীভাবে ফল সংরক্ষণের পদ্ধতি হলো- চিনি, লবণ ও ভিনেগার ব্যবহার, বিভিন্ন সংরক্ষণকারী দ্রব্যের ব্যবহার, পানির পরিমাণ কমানো, গাজানো, টিনজাত করা ও ডীপ ফ্রিজিং বা অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা ব্যবহার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাকার সময় শ্বসনের হার অনুযায়ী ফলকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
- ক) চার ভাগে
- খ) দুই ভাগে
- গ) তিন ভাগে
- ঘ) ছয় ভাগে

২। ফল পাকার সময় ক্লোরোফিলের ক্ষেত্রে নিচের কোন্‌টি সঠিক?
- ক) ফেনোলিকসের পরিমাণ কমে ও শুক্রোজের পরিমাণ বাড়ে।
- খ) ফেনোলিকসের পরিমাণ বাড়ে ও গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে।
- গ) জৈব ফেনোলিকসের পরিমাণ বাড়ে ও জৈব এসিডের পরিমাণ বাড়ে।
- ঘ) ফেনোলিকস, গ্লুকোজ ও জৈব এসিডের পরিমাণ বাড়ে

৩। টিনজাত ফল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- ক) ১-২ বৎসর পর্যন্ত রাখা যায়
- খ) ১-৩ বৎসর পর্যন্ত রাখা যায়
- গ) ১-৪ বৎসর পর্যন্ত রাখা যায়
- ঘ) ১-৫ বৎসর পর্যন্ত রাখা যায়

৪। ফলের রস এবং পানি পাস্তুরাইজেশনের তাপমাত্রা কোন্‌টি?
- ক) ৮০° সেলসিয়াস
- খ) ৯০° ”
- গ) ১০০° ”
- ঘ) ১২০° ”

৫। ফল পাকানোর হরমোন কোন্‌টি?
- ক) ইনডোল এসিটিক এসিড
- খ) নেপথোলিন এসিটিক এসিড
- গ) জিবারাইলিক এসিড
- ঘ) ইথিলিন

পাঠ ৫.৫ তাজা ফল সংরক্ষণ পরিবেশ ও পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- তাজা ফল সংরক্ষণের পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- তাজা ফল সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

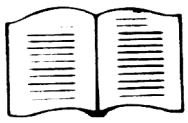

তাজা ফল সংরক্ষণ পরিবেশ

তাজা ফল গুদামজাতকরণের জন্য গুদামে বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন হয়। তাজা ফল গুদামজাতকরণের পরিবেশগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু চলাচল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাজা ফল গুদামজাতকরণের জন্য তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচলের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলোঃ

তাপমাত্রা ঃ তাজা ফল সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণে তাপমাত্রা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তাপমাত্রা নির্ভর করে জাত, ফল সংগ্রহের সময়, পরিপক্কতা, ফল সংগ্রহ ও গুদামজাতকরণের মধ্যবর্তী সময়, ক্লাইমেকটারিক, মৌসুমীয় পরিবর্তন ইত্যাদির ওপর । সাবধানে ফল সংগ্রহ, শক্ত কিন্তু যথাযথ বাতাস চলাচল সম্পন্ন প্যাকিং ইত্যাদি তাজা ফল গুদামজাতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফল সাধারণত কম তাপমাত্রায় গুদামজাত করা হয়। কারণ কম তাপমাত্রার ফলে প্রশ্বেদন, শ্বসন, বাস্পীভবন এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী কম হয়। অন্য দিকে নিু তাপমাত্রায় বিভিন্ন ক্ষতিকর ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার কার্যাবলী কমে যায়। যার দরুন ফলের সংরক্ষণ সময় বাড়ে।

তাজা ফল সংরক্ষণে আর্দ্রতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় তাজা ফল সংরক্ষণ করা হয়।

আর্দ্রতাঃ তাজা ফল সংরক্ষণে আর্দ্রতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় তাজা ফল সংরক্ষণ করা হয়। অধিক আর্দ্রতায় তাজা ফলে প্রশ্বেদন ও বাস্পীভবন কম হয়। অন্যদিকে আর্দ্রতা কমার সাথে অধিক প্রশ্বেদন ও বাস্পীভবনের জন্য ফলের ওজন কমে যায় এবং চামড়া কুচকে যায়। এজন্য ফল ভোক্তার আকর্ষণ হারায়।

মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাঃ গুদামে কার্বন-ডাই-আক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ফলের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে পড়ে। সাধারণত শ্বসনের জন্য গুদামে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে। অধিকাংশ ফলের ক্ষেত্রে গুদামে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ১% এর নিচে হওয়া উচিত। এ জন্য গুদামে যেন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ না বাড়ে সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং গুদামে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফল সংগ্রহের পর থেকে ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অন্যতম করণীয় কাজ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাঃ ফল সংগ্রহের পর থেকে ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অন্যতম করণীয় কাজ। গুদাম অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যেন রোগজীবাণু গুদামে বাসা বাধতে না পারে। এজন্য গুদামে ফল সংরক্ষণের পূর্বে ফল এবং গুদাম উভয়ই জীবাণুনাশক ব্যবহার করে অথবা গরম পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া ভালো। যেমন আম ৫৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২ মিনিট রাখলে সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে।

তাজাফল সংরক্ষণের পদ্ধতি

বাংলাদেশে ফলের মৌসুমে সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর পরিমাণ ফল নষ্ট হয়। অপর দিকে মৌসুম শেষে ফলের প্রাপ্যতা কমে যায় এবং অনেক সময় ফল দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। এ জন্য ফল যেন সব সময় পাওয়া যায় এবং সহজে নষ্ট না হয় সেজন্য ফল গুদামজাত করা হয়। গুদামজাতকরণের প্রাথমিক সুবিধা হলো ফলের শ্বসন, প্রশ্বেদন, ফল পাকা এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ও বিভিন্ন রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রণ করে ফল অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। যার দরুন ফল ভোক্তার নিকট দীর্ঘদিন যাবৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

রেফ্রিজারেটর ও ডীপ ফ্রীজ (Refrigerator and Deep freeze) ঃ অল্প পরিমাণ ফল সংরক্ষণে এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর। এ পদ্ধতিতে সাধারণ ফ্রীজে অথবা ডীপ ফ্রীজের ঠান্ডা তাপমাত্রায় অনেক দিন পর্যন্ত ফল সংরক্ষণ করা যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রার ফলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী কমে যায়। সাথে সাথে রোগ জীবাণুর আক্রমণ কম হওয়ার ফলে পচন ধরেনা। বাড়ীতে খাওয়ার জন্য ফল সংরক্ষণে এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর। এ পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের জন্য তা পরিপক্ক, রোগ জীবাণু মুক্ত এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

হিমাগারে কম তাপমাত্রায় ও বেশি আর্দ্রতায় ফল সংরক্ষন করা হয়।

হিমাগার (Cold storage) ঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফল সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে গুদামের তাপমাত্রা কমিয়ে একটি আকাংখিত লেভেলে আনা হয়। সাথে সাথে ফল থেকে যেন প্রশ্বেদনের মাধ্যমে পানি হ্রাস না পায় সেজন্য গুদামে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ানো হয়। যার দরুন হিমাগারে অনেকদিন পর্যন্ত ফল সংরক্ষণ করা যায়। তবে গুদামের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার ওপর ফলের স্থায়িত্বকাল নির্ভর করে। গুদামের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নির্ভর করে বিভিন্ন ফলের ওপর। সারণি ২-এ কয়েকটি উষ্ণমন্ডলীয় ফলের গুদামজাতকরণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও স্থায়িত্বকাল দেয়া হলোঃ

সারণি ২ঃ কয়েকটি উষ্ণমন্ডলীয় ফলের গুদামজাতকরণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও স্থায়িত্বকাল

ফল	তাপমাত্রা (° সে.)	আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	গুদামে স্থায়িত্বকাল (সপ্তাহ)
আম	৮-১০	৮৫-৯০	৪
আনারস	৮-১০	৮৫-৯০	১-২
কলা	১৩	৮৫-৯০	১-৫
কাঁঠাল	১১-১৩	৮৫-৯০	৬
লিচু	২	৮৫-৯০	৮-১২
লেবু (কাগজী)	১১-১৩	৮৫-৯০	৮
লেবু (এলাচী)	৫-৭	৮৫-৯০	৬
বেল	৯	৮৫-৯০	১০-১২
পেঁপে	৮	৮৫-৯০	২-৩

আইস ব্যাংক কুলার (Ice Bank Cooler) ঃ এটি রেফ্রিজারেশনের উন্নত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে খুব ঠান্ডা বাতাস ফলের বক্সের ওপর প্রবাহিত করা হয়। যার দরুন খুব তাড়াতাড়ি অধিক পরিমাণ তাপ কমানো যায়। তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করার পর গুদামে ০.৫-০.৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং ৯৮% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ফল সংরক্ষণ করা হয়।

শৈত্যাঘাত (Chilling injury)

হিমাগারে সংরক্ষণের সময়ে অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় ফলের গঠনের পরিবর্তন হয় এবং অনেক সময় সংরক্ষিত ফলের মান কমে যায়। একে শৈত্যাঘাত বা Chilling injury বলা হয়। শৈত্যাঘাত গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফলে বেশি দেখা যায়। শৈত্যাঘাতের জন্য ফল সংরক্ষণে অথবা দূরবর্তী স্থানে প্রেরনের সময় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফলের চারদিকের আবহা-ওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে এ পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণ করা হয়।

নিয়ন্ত্রিত/রূপান্তরিত আবহাওয়া মন্ডল (Controlled/Modified Atomosphere)ঃ এ পদ্ধতিতে গুদামের বায়ুমন্ডল নিয়ন্ত্রণ করে ফল গুদামজাত করা হয়। এ জন্য ফলের চারিদিকে গ্যাস নিরোধক

আচ্ছাদন বা মোড়ক ব্যবহার করা হয। সাথে সাথে গুদামে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করা হয। রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির সাথে সমন্বিতভাবে ব্যবহারে এ পদ্ধতি ফলের আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল, আমের জন্য এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের পরিবেশ হলো ৫% কার্বন ডাই-অক্সাইড, ৫% অক্সিজেন এবং ১৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। এ ছাড়াও পেঁপে, আনারস, কলা ইত্যাদি ফল গুদামজাতকরণে এ পদ্ধতি ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়েছে।

হাইপোবেরিক (Hypobaric) বা সাব এটমোসফেরিক (Sub atmospheric) সংরক্ষন পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে ফলকে সাধারণত বায়ুরোধী রেফ্রিজারেটেড পাত্রে রেখে পাত্রটি ভ্যাকুম-পাম্পের মাধ্যমে আকাংখিত বায়ু চাপে আনা হয়। শ্বসন হ্রাস ও ইথিলিন গ্যাস কম থাকার জন্য ফলের পাকা ও বার্ধক্য প্রাপ্তি হ্রাস পায়। যার দরুণ ফলের আয়ুষ্কাল বাড়ে। কিন্তু এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল ও জটিল হওয়ার দরুন খুব কম ব্যবহৃত হয়।

মোম আবৃতকরণ (Waxing)

প্রাকৃতিকভাবে ফল মোমজাতীয় পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। যার দরুন ফল রোগজীবাণু দ্বারা পচন থেকে রক্ষা পায়। সাথে সাথে ফলে শ্বসন ও প্রস্বেদনও কম হয়। কিন্তু ফল সংগ্রহ, স্থানান্তর ও ধোয়ার সময় প্রাকৃতিক মোমের স্তর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার দরুন ফল বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পচে যায়। এ জন্য যেখানে রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের সুবিধা নাই সেখানে ফলকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে মোম দ্বারা আবৃত করে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। আম মোমাবৃতকরণ করে সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়েছে।

পলিথিন আবরণ (Polythene film)

পলিথিন আবরণ শ্বসন ও প্রস্বেদন হ্রাস করে। যার দরুন আঙুর, আম ও অন্যান্য ফল তাজা অবস্থায় পলিথিন ব্যাগে

বিভিন্ন ধরনের সেমিপার্মিয়েবল (Semipermeable) আবরন (film) মোড়ক হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফল গুদামজাতকরণে মোড়ক হিসেবে পলিথিনের ব্যবহার বেড়েছে। পলিথিন ব্যাগ শ্বসন ও প্রশ্বেদন হ্রাস করে। যার দরুন আঙুর, আম ও অন্যান্য ফল সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে পলিথিন ব্যাগের আবরণ বা মোড়ক ভালো বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার (Use of different chemicals) ঃ ছত্রাকনাশক ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য যেমন জিবারেলিক এসিড, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ভার্মিকুলাইট, ম্যালিক হাইড্রাজাইড, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি ফল সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন ফল সংগ্রহের আগে ০.৬% ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ১% ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ছিটানোর দরুন পেয়ারার সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সংগ্রহের পর ১০০০-২০০০ পিপিএম ম্যালিক হাইড্রাজাইডের দ্রবণে চুবালে আম দেরীতে পাকে।

বিকিরণ পদ্ধতির ব্যবহার (Use of radiation)

বিকিরণের মাধ্যমে রোগ জীবাণু ও পোকা মাকড় মারা যায় এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের জন্য ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে।

বিকিরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন ফল ও শাকসবজির সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি করা যায়। বিকিরণের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগজীবাণু ও পোকা মাকড় মারা যায়। সাথে সাথে ফলের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের জন্য তাজা ফলের সংরক্ষণকাল বাড়ে। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে বিকিরণ ব্যবহারে আম পাকানো হ্রাস করা যায়। ২৫-৩০ কিলোর‍্যাড বিকিরণ ব্যবহার করে কলার মান নষ্ট না করেও প্রাকৃতিকভাবে পাকার সময় বাড়ানো যায়। তবে এ পদ্ধতি আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় না। কারণ এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল এবং জটিল

বাষ্পীভবন-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি (Evaporative Cooling-Cool Chambers)ঃ কোন তল (Surface) থেকে পানি বাষ্পীভবনের সাথে সাথে প্রচুর তাপ আর্দ্রতার সাথে চলে যায়। যার দরুন তলের তাপমাত্রা কমে। এ নীতিমালা ব্যবহার করে বাষ্পীভবন-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি

বাষ্পীভবন-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি ব্যবহারে প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা কমে এবং আর্দ্রতা বাড়ে। যার দরুন অস্থায়ীভাবে এ প্রকোষ্ঠে বেশ কিছু দিন ফল সংরক্ষণ করা যায়।

উদ্ভাবন করা হয়েছে। আসলে এ পদ্ধতি অত্যন্ত প্রাচীন। খুব কম খরচে এবং দেশী সামগ্রী ব্যবহার করে বাষ্পীকরণ-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ তৈরি করা যায়। এ পদ্ধতিতে প্রকোষ্ঠের মেঝে এক সারি ইট দ্বারা তৈরি করা হয়। দেয়াল তৈরি করা হয় দুটো সারি ইট দ্বারা এবং দুই সারি ইটের মাঝে ৭.৫ সেঃমিঃ ফাঁকা জায়গা রাখা হয় যা বালি দ্বারা পূরণ করা হয়। প্রকোষ্ঠের উপরের ঢাকনা বাঁশের ফ্রেম দ্বারা তৈরি করা হয় এবং তা পাটের চট দ্বারা আবৃত করা হয়। ঠান্ডা প্রকোষ্ঠটি একবার পরিপ র্ণভাবে আর্দ্র হয়ে পড়লে প্রতিদিন সকাল ও বিকালে দেয়ালের চার পাশে এবং উপরে পানি ছিটিয়ে দিলে প্রকোষ্ঠটি ঠান্ডা ও আর্দ্র থাকে। গ্রীষ্মকালে এ প্রকোষ্ঠে ১৭-১৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং ৯৫% আর্দ্রতা রক্ষা করা যায়। স্বল্প সময়ের জন্য ফল গুদামজাত করার জন্য এ প্রকোষ্ঠ খুব ভালো। ঠান্ডা প্রকোষ্ঠে ফল সমভাবে পাকে এবং উপযুক্ত অবস্থায় থাকে।

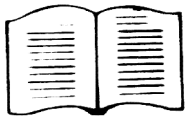

সারমর্মঃ তাজা ফল পাকার দরুন বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যেমন পানি কমে যাওয়া, শর্করার পরিবর্তন, গন্ধ, নরম হওয়া, রংয়ের পরিবর্তন, ভিটামিনস নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং পচে যাওয়া। পরিবর্তনগুলো ক্ষতিকর অথবা উপকারী উভয়ই হতে পারে। তবে ক্ষতিকর পরিবর্তনেই বেশি সংঘটিত হয়। তাজা ফল সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাজা ফল সংরক্ষণে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা তাজা ফল সংরক্ষণ করতে পারি। এগুলোর মধ্যে রেফ্রিজারেটর ও ডীপ ফ্রীজ, হিমাগার, আইস ব্যাংক কুলার, নিয়ন্ত্রিত/রূপান্তরিত আবহাওয়া মন্ডল, হাইপোবেরিক সংরক্ষণ, মোম আবৃতকরণ, পলিথিন, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার, বিকিরণ পদ্ধতি বাষ্পী ভবন-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি অন্যতম। রেফ্রিজারেটর, ডীপ ফ্রিজ, হিমাগার, আইস ব্যাংক কুলার ইত্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতিতে ঠান্ডা তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় ফল সংরক্ষণ করলে ফলে শৈত্যাঘাত বা চিলিং ইনজুরি দেখা যায়। এ জন্য ফল উপযোগী নিম্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করা উচিত। যেখানে হিমাগার নাই সেখানে অন্যান্য সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিচের কোন্‌টি তাজা ফল সংরক্ষণের পরিবেশ নয়?
- (ক) নিম্ন তাপমাত্রা
- (খ) অধিক আর্দ্রতা
- (গ) উচ্চ তাপমাত্রা
- (ঘ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

২। ফলের গুদামে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কত হওয়া উচিত?
- (ক) ৪% এর নিচে
- (খ) ১% এর নিচে
- (গ) ১০% এর নিচে
- (ঘ) ২% এর নিচে

৩। হিমাগারে আম সংরক্ষণের তাপমাত্রা কোনটি?
- (ক) ৮-১০$^{\circ}$ সে.
- (খ) ০-১$^{\circ}$ সে.
- (গ) ২০-২৫$^{\circ}$ সে.
- (ঘ) ২৫-৩০$^{\circ}$ সে.

৪। বিকিরণ পদ্ধতিতে কলা সংরক্ষণের জন্য বিকিরনের পরিমাণ কোনটি?
- (ক) ৫০-৩০ কিলোর‍্যাড
- (খ) ০-১০ কিলোর‍্যাড
- (গ) ১০০-২০০ কিলোর‍্যাড
- (ঘ) ২৫-৩০ কিলোর‍্যাড

৫। সাধারণত কত আপেক্ষিক আর্দ্রতায় তাজা ফল সংরক্ষণ করা হয়?
- ক) ৯০ - ৯৫%
- খ) ৮৫ - ৯০%
- গ) ৮৫ - ৯৫%
- ঘ) ৮০ - ৮৫%

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনা মূলক প্রশ্নাবলী

১। আন্ত পরিচর্যা কী? ফল বাগানে করণীয় আন্ত পরিচর্যা সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২। অফলন্ত ও ফলন্ত গাছ কাকে বলে? গাছ অফলন্ত হওয়ার কারণসমূহ তালিকা বদ্ধ করুন।

৩। অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণ পদ্ধতিসম হ আলোচনা করুন।

৪। ফসল পর্যায় কী? জমিতে ফসল পর্যায় কেন ব্যবহার করা হয়? ফসল পর্যায়ের মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। একটি জমিতে ৬ বছরের জন্য একটি ফসল পর্যায় তৈরি করুন।

৫। সাথী ফসল কী? জমিতে সাথী ফসল নির্বাচনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করুন।

৬। ফলের পরিপক্কতার লক্ষণ কাকে বলে? ফলের পরিপক্কতা ও পাকার মধ্যে পার্থক্য কী? ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭। শ্বসনের হার অনুযায়ী ফলসম হের শ্রেণিবিন্যাস করুন। ফল পাকানোয় ইথিলিনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৮। তাজাফল গুদামজাতকরণে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচলের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৯। তাজাফলসমূহ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহ বর্ণনা করুন।

১০। ফল সংরক্ষণের নীতিমালা বর্ণনা করুন।

উত্তর মালা – ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। গ ২। খ ৩। গ

পাঠ ৫.২

১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। খ

পাঠ ৫.৩

১। ঘ ২। ঘ ৩। গ

ক) <u>পরিপক্কতার</u> খ) <u>পাকা</u> গ) <u>পরিপক্ক</u> ঘ) <u>আকার</u> <u>মান</u>

পাঠ ৫.৪

১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ ৫.৫

১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ